ভূমিকা

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন প্রায় বাহান্ন বছর শান্তিনিকেতন আশ্রমে কাটিয়েছেন, তার মধ্যে বত্রিশ বছর কেটেছে প্রত্যক্ষত রবীন্দ্রসান্নিধ্যে। সৃজ্যমান শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষকতার কাজে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ১৯০৮ সালে আহ্বান করে এনেছিলেন। তখন ক্ষিতিমোহনের বয়স আটাশ। অনূর্ধ্ব তিরিশের সেই যুবার জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ, জড়িয়ে গেল শান্তিনিকেতন। সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতায় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর ঋণের কথা স্বীকার করেছেন ক্ষিতিমোহন। পরিণত বয়সে অনুজ সহকর্মীদের অনায়াসে বলতেন, আমরা ছিলাম মাটির তাল, গুরুদেব আমাদের গড়েপিটে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পাকা জহুরি। প্রথম থেকেই এই অশেষ সম্ভবনাময় ও অন্তশৈর্যে সম্পদবান মানুষটির প্রতি তিনি গভীর প্রত্যাশায় হাত বাড়িয়েছেন। তাঁকে সহযোগী পেয়ে সম্পন্ন হয়েছেন।

বাউল ও সন্তদের আত্মিক উপলব্ধিজাত বাণী পরিবেশন করে পিপাসু আশ্রমিকদের তৃষ্ণা মেটাতেন ক্ষিতিমোহন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন :

অ্যাকা নবরতন ক্ষিতিমোহন
ভকতি-রসের রসিক।
কবীর-কামধেনু করি দোহন
তোষেন তৃষিত পথিক।।

আশ্রমে এসে নবরত্ন বলে গণ্য হলেন। সুদুর চম্বায় কর্মরত ক্ষিতিমোহনকে শান্তিনিকেতনের আহ্বান প্রেরণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> ভারতবর্ষে আমরা মিথ্যার জালে জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছি— বিদেশীর কাছে আমাদের বাহ্য অধীনতা কিছুই নহে কিন্তু আমাদের সমস্ত জীবন আমাদের অন্তঃকরণ মিথ্যার দাসত্বে বিক্রীত। ইহাই আমাদের সমস্ত দুর্গতির কারণ। আমাদের বিদ্যালয়ে সত্যের যেন অবমাননা না হয়— ছাত্রেরা যেন সত্যকে নির্ভয়ে স্বীকার করিয়া জীবনকে ধন্য করিতে পারে সেই পরম শক্তি তাহাদের মধ্যে সঞ্চার করিতে হইবে— এই আমার একান্ত কামনা জানিবেন।

অর্ধশতাব্দীকাল শান্তিনিকেতনে সত্য ও জ্ঞানের আলোয় বালকচিত্ত উদ্‌বোধনের সাধনায় ক্ষিতিমোহন সেন ব্যাপৃত থেকেছেন, সেখানে কোনো ফাঁকি ছিল না। অনুক্ষণ তাঁর মনের মধ্যে মিশেছিল সন্ত ও বাউল রসের সঙ্গে রবীন্দ্রসৃষ্টির রস।

কয়েক বছর থেকে ক্ষিতিমোহন সেনের প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশের সংকল্প করেছিলাম। অনিবার্য দীর্ঘ বিলম্বের বাধা পেরিয়ে এইবার তাঁর রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক রচনাগুলির সংকলন প্রকাশ করা সম্ভব হল। ইতিপূর্বে সাময়িক পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা তাঁর প্রবন্ধগুলি *সাধক ও সাধনা* (২০০৩) *ভারত পরিক্রমা* (২০০৪) এবং *বঙ্গমানস ও অন্যান্য* (২০০৬) গ্রন্থে সংকলন করেছি।

ক্ষিতিমোহন রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই তাঁর সম্পর্কে প্রথম প্রবন্ধটি লেখেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে 'রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার আশ্রম' প্রবাসী পত্রিকার ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। কবির প্রয়াণের পরে তিনি তাঁর সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন। ক্ষিতিমোহনের রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক প্রবন্ধ যেমন বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তেমনই প্রায় নিয়মিত বেরিয়েছে আনন্দবাজার পত্রিকায়। এই পত্রিকার বেশ কিছু প্রবন্ধ সংগ্রহে আনন্দবাজার পত্রিকার গ্রন্থাগারের সহায়তা অপরিহার্য ছিল। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

ক্ষিতিমোহন সেনের মৃত্যুর পরেও তাঁর কয়েকটি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এই লেখাগুলি বারবার পড়ে দেখেছি। তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধের তুলনায় এগুলি অসংবদ্ধ ও বিষয়বস্তুর বিচারে অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়েছে। আমাদের ধারণা এগুলি তাঁর বক্তৃতার অন্যের নেওয়া নোট থেকে বা কখনো ক্ষিতিমোহনের ডায়েরি খাতা থেকে নিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। এইগুলি আমরা সংকলনভুক্ত করা সমীচীন মনে করিনি।

বেশ কিছুকাল যাবৎ আনন্দবাজার পত্রিকার ছোটোদের পাতা আনন্দমেলার পরিচালক বিমল ঘোষ (মৌমাছি) প্রায় প্রতি বছর পঁচিশে বৈশাখ উপলক্ষে ক্ষিতিমোহন সেনের রচনা প্রকাশ করেছেন। এই লেখাগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা এই সংকলনের জন্যে আমরা নির্বাচিত করেছি। ছোটোদের জন্য ক্ষিতিমোহন সেনের কিছু লেখা আছে পূর্ববর্তী সংকলনেও।

পাঠক দেখবেন এই গ্রন্থের কোনো কোনো রচনায় একই প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ছোটোদের লেখাগুলিতেও সেটা আছে। ক্ষিতিমোহন সেনের রচনার সাবলীলতা ও প্রসাদগুণ এমনই যে আশাকরি সাহিত্যরসিক ও রবীন্দ্রানুরাগী পাঠক এই ত্রুটিটুকু সহজেই মেনে নিতে পারবেন।

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে ক্ষিতিমোহন সেনকে আচার্যের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। প্রথম অনেকগুলি বছর মুখ্যত তিনি এবং বিধুশেখর শাস্ত্রী নানা উপলক্ষে বৈদিক মন্ত্র সংকলন করতেন। পঁচিশে বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে যেমন তাঁরা উপযোগী মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন তেমনই তাঁর দৌহিত্রী নন্দিনীর বিবাহ অনুষ্ঠানে আচার্যের ভূমিকা তাঁদের ছিল। অবশেষে এই দুই সতীর্থ আশ্রমগুরুর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বেদিতেও আসন পরিগ্রহ করেছেন। অবশেষে বললাম বটে, প্রকৃতপক্ষে কী রবীন্দ্রনাথের কালে কী রবীন্দ্রোত্তর কালে ক্ষিতিমোহন সেন শান্তিনিকেতনের উৎসব অনুষ্ঠানে আচার্যের আসনে উপবিষ্ট হয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের আদেশে শান্তিনিকেতনের বাইরেও ক্ষিতিমোহনকে বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে আচার্যের ভূমিকা পালন করতে হত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আদি ব্রাহ্মসমাজের ১১ মাঘের উপাসনায় আচার্য পদে বরণ করে নিয়েছিলেন। সুদীর্ঘকাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবের উপাসনাতেও এই অব্রাহ্ম মানুষটি একই ভূমিকা পালন করেছেন। আশ্রমগুরুর জন্মোৎসবে ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পত্রী সহ আর যে সেকালের কয়টি অনুষ্ঠান পত্রী আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে সেগুলি সংকলিত হল। এর মধ্যে গৃহপ্রবেশ-বিবাহ ইত্যাদির অনুষ্ঠানপত্রী যেমন আছে তেমনই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে শান্তিনিকেতনে মন্দির উপাসনায় ক্ষিতিমোহন সেন যে অনুষ্ঠান পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন সেটিও আছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিবিধ বিষয়ে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের যতগুলি প্রবন্ধ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি এই চারটি সংকলন গ্রন্থে সেগুলি স্থান পেল। এর বাইরেও হয়তো তাঁর আরও প্রবন্ধ রয়ে গেল। ভবিষ্যতে তেমন কোনও প্রবন্ধের সন্ধান যদি পাই কোনও সহৃদয় পাঠকের কাছ থেকে, তাহলে পরবর্তী সংস্করণে যুক্ত করার বাসনা রইল।

পুনশ্চ প্রকাশনার সত্ত্বাধিকারী শ্রীসন্দীপ নায়ক যিনি আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, এবং আমার ছাত্র শ্রীঅভীককুমার দে যিনি এই চার খণ্ড সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের নেপথ্যে থেকে প্রুফ দেখা নির্দেশিকা প্রস্তুত করা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ স্বেচ্ছায় স্বীকার করেছিলেন *রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন* নামক গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আপাতত এই বিষয়ে তাঁদের উভয়েরই ভূমিকা সম্পন্ন হল বলতে পারি। আমিও ছুটি পেলাম।

শ্রীপঞ্চমী ১৪১৫ প্রণতি মুখোপাধ্যায়

সূচিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার আশ্রম	১৫
রবীন্দ্রনাথ ও মানব মাহাত্ম্য	২৬
আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ	৩২
রবীন্দ্রনাথের মতে নারীর সাধনা	৩৯
রবীন্দ্র স্মৃতিদিবস	৫০
ব্রতের দীক্ষা	৫৩
বেদমন্ত্ররসিক রবীন্দ্রনাথ	৫৮
রবীন্দ্রনাথ ও ধর্মপ্রচার	৬৪
রবীন্দ্রনাথের বেদমন্ত্রানুবাদ	৬৭
রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দবাবু	৭৩
ভারতীয় সাধনার ধারায় রবীন্দ্রনাথ	৮৫
রবীন্দ্র জন্ম প্রশস্তি	১০০
পুরাতন কথা	১০৪
চিন-ভারতের মৈত্রী সাধনায় রবীন্দ্রনাথ	১১১
রবীন্দ্র-জয়ন্তী	১১৬
গতির উপাসক	১২৭
রবীন্দ্র জয়ন্তী	১৪৩
মানবদরদি রবীন্দ্রনাথ	১৪৯
মানবতাধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ	১৫৮
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষামন্দির (রবীন্দ্রনাথের আপন বিবৃতি)	১৬৭
তিলক-রবীন্দ্রনাথ ও কংগ্রেস	১৭৩

রবীন্দ্রনাথের বসন্ত পূর্ণিমা ১৮২
নববর্ষ ও রবীন্দ্রনাথ ১৯০
অস্পৃশ্যতা-বিরোধী গুরুদেব ও মহাত্মা ১৯৫
মহাপুরুষ গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ ১৯৭
বিশ্বশান্তি সম্মেলন ও ভারতবর্ষ ২০৬
মহর্ষির আশ্রমে বিশ্বশান্তি সম্মেলন ২১২
রবীন্দ্রনাথ ও তিলক ২১৭
মৃত্যুঞ্জয় রবীন্দ্রনাথ ২২৫
আমার কথা ২৩২
কবিগুরুর জন্মোৎসব ২৪৬
রবীন্দ্র-প্রেরণার উৎস ২৪৮
শারদীয়া পূজা ও বিজয়া ২৫২
গুরুদেবের দৃষ্টিতে মৃত্যু ২৫৬
দেশ ও বিদেশ ২৬১
বটতরুমূলে ২৬৫
শারদোৎসবের জন্মকথা ২৬৮
শান্তিনিকেতনের দীক্ষা-আহ্বান ২৭২
রবীন্দ্রনাথের শিশুপ্রীতি ২৭৬
শিশুদের পঁচিশে বৈশাখ ২৭৭
চিনা শিশুদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ২৮২
রবীন্দ্রনাথের গল্প ২৮৭
তোমাদের রবীন্দ্রজন্মোৎসব ২৯১
শিশু রবির পরিচয় ২৯৪
কবির চোখে 'জন্মদিন' ২৯৭
রবীন্দ্রনাথের সংবাদ সম্পাদনা ও তর্জমা ৩০০

উৎসব-অনুষ্ঠান

তাই চি তাও সম্বর্ধনা ৩০৫
রবীন্দ্র জয়ন্তী ১৩৩৮ ৩১০
পরলোকগতা মনোরমা দেবীর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান ৩১৯
জলোৎসর্গ ৩২৮
অভিভাষণ ৩৩০
রবীন্দ্র জয়ন্তী ১৩৪৫ ৩৩৪
কল্যাণীয়া নন্দিনী-কল্যাণীয় অজিত সিংহ মোরারজীর শুভবিবাহ্-পদ্ধতি ৩৩৯
দ্বারমোচন অনুষ্ঠান, ১৩৪৬ ৩৬০
পৃথিবীর স্তব ৩৭০
আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধবাসর ৩৭৪
বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ উৎসব ৩৯০
শ্রীনিকেতন সাম্বৎসরিক উৎসব ৩৯৯
বিশ্বকর্মা উৎসব ৪১৩
১৩৫৪ সালের ২৯শে শ্রাবণের (১৫ আগষ্ট) উৎসবসূচি ৪১৮
বিবাহ-পদ্ধতি : নন্দিতা দেবী ও নৃপেন্দ্রপ্রসন্ন সেন ৪২৫
ভারতে বৃক্ষ-রোপণ-অনুষ্ঠান ৪৩২
শিল্পগুরু শ্রীনন্দলাল বসুর চিত্রপ্রদর্শনী ৪৪২
নির্দেশিকা ৪৪৯

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার আশ্রম

১৯০৮ সাল, আষাঢ় মাস। শান্তিনিকেতন আশ্রমের কাজে যোগ দিতে আসিয়া রাত্রে বোলপুর স্টেশনে নামিলাম। ভয়ংকর বৃষ্টি; তখনকার দিনে গো-গাড়ি ছাড়া আর যান ছিল না। পরদিন সকালে পদব্রজেই আশ্রমে রওয়ানা হইলাম। বোলপুরে তখন এত বাড়িঘর ছিল না। স্টেশন হইতে পথে নামিয়াই শুনিলাম কবি গাহিতেছেন, 'তুমি আপনি জাগাও মোরে।' কী শক্তি তখন তাঁহার কণ্ঠে ছিল! শান্তিনিকেতনে তাঁহার দেহলী নামক গৃহের দোতলায় তিনি দাঁড়াইয়া গাহিতেছেন আর বোলপুরে তাহা শুনা যাইতেছে। অবশ্য তখন বোলপুরের পথ বড়ো নির্জন ও শান্ত ছিল।

তখন আশ্রম ছিল অনেক ছোটো। অধ্যাপকরা সকলেই থাকিতেন ছাত্রদের সঙ্গে। জগদানন্দ রায় মহাশয়ের পত্নী পরলোকগমন করায় একমাত্র তিনি ছেলেপিলে লইয়া একটি স্বতন্ত্র বাড়িতে থাকিতেন। সেই বাড়ি আর এখন নাই। রবীন্দ্রনাথ থাকিতেন তাঁহার দেহলী নামক ছোটো বাড়িটির দোতলায়।

আশ্রমে প্রবেশ করিতেই দেখিলাম আমার পুরাতন বন্ধু কাশীর সতীর্থ বিধুশেখর ভট্টাচার্যকে ও দাদা ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে। কাশীতে সকলেই আমাকে 'ঠাকুরদাদা' বলিয়া ডাকিতেন, তাঁহারা ইহা তৎক্ষণাৎ ফাঁস করিয়া দিলেন।

আশ্রমে তখন লোকসংখ্যাও খুব কম। প্রতি বেলায় ছাত্র ও অধ্যাপকে মিলিয়া জন পঞ্চাশেকের পাত পড়ে। ভূপেন্দ্রদাদা আশ্রমের আয়ব্যয় দেখেন ও হিসাবপত্র রাখেন। আলাদা কোনো আপিস নাই। অধ্যাপকদের মধ্যে এক-একজন রান্নাঘরের সব ব্যবস্থার তদারক করেন।

কবির দেহলী বাড়িটি অতিশয় ক্ষুদ্র। ছোটো বাড়িই তাঁহার পছন্দ। বড়ো বাড়িতে নাকি মানুষ আপনাকে হারাইয়া ফেলে। ছোটো জিনিসের প্রতি কখনও তাঁহার অশ্রদ্ধা দেখি নাই। তাই শিশুদের প্রতি তাঁর স্নেহের অন্ত ছিল না এবং ক্ষুদ্র আরম্ভকে তিনি কোনোদিন অবজ্ঞা করেন নাই।

সতীশচন্দ্র রায়ের স্মৃতিতে আশ্রম তখন ভরপুর। এমন প্রতিভা শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা এখনকার দিনে দুর্লভ। যে 'গুরুদেব' নামে কবি এখন সর্বত্র পরিচিত সেই নামটি সতীশচন্দ্রই রাখিয়া গিয়াছেন। হয়তো সতীশচন্দ্র এই নামটি পাইয়াছিলেন আচার্য ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় হইতে। কিন্তু আশ্রমের সকলের কাছে শুনিয়াছি তাঁহারা ইহা পাইয়াছেন সতীশচন্দ্রের কাছে। যাঁহারা সতীশচন্দ্রের *গুরুদক্ষিণা* বইখানি পড়িয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন সতীশচন্দ্র কী মানুষ ছিলেন। অত্যন্ত অকালে তিনি হঠাৎ মারা যান।

এই আশ্রম-প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল এই দেশের প্রাচীন সাধনার প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা। তাঁহার গভীর দেশপ্রীতির কথা বলা আমার নিষ্প্রয়োজন। বাংলা দেশে জাতীয় শিক্ষার আয়োজনে, শিবাজী-উৎসব প্রভৃতির অনুষ্ঠানে, স্বদেশি গানে, স্বদেশ ও সঙ্কল্প, নৈবেদ্য, গান্ধারীর আবেদন প্রভৃতি রচনায় অত্যুক্তি, অপমানের প্রতিকার প্রভৃতি প্রবন্ধে, মেঘ ও রৌদ্র, রাজটীকা প্রভৃতি গল্পে তাহার যথেষ্ট পরিচয় রহিয়া গিয়াছে। *গোরার* যুক্তিগুলি তো অনেকেরই স্বদেশনিষ্ঠার খোরাক ও বক্তব্য জোগাইয়াছে। এইসব লেখা লিখিয়াও তাঁহার হৃদয় তৃপ্ত হইল না। তিনি প্রাচীন কালের আদর্শে দেশের ভবিষ্যৎ মানুষদের গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। প্রাচীন ভারতে তপোবনে শিশুরা স্নেহে ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিবৃত হইয়া বৃহৎ আদর্শের মধ্যে দিনে দিনে মানুষ হইয়া উঠিত।

সাধারণ বিদ্যালয়ের শুষ্ক প্রাণহীন সংকীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে সুকুমার শিশুরা যে দুঃখ পায়, তাহা হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য গুরুগৃহবাসী শিষ্যদের আদর্শে শিশুগণের জীবনকে গড়িয়া তুলিবার কাজে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। বোলপুরের নিকট বিশাল নির্জন প্রান্তরে মহর্ষিদেবের যে একটি শান্ত তপস্যার ক্ষেত্র ছিল সেইখানে তিনি দুইটি মাত্র ছাত্রকে* লইয়া কাজে হাত দিলেন। তখন তিনি নিঃসম্বল এবং বাহিরে বাধাবিঘ্নের অন্ত নাই। এমন লঘু আরম্ভকে খুব অল্প লোকেই শ্রদ্ধা করিতে পারে। কিন্তু তাঁহার দিব্যদৃষ্টির কাছে এই সামান্য অঙ্কুরের মধ্যেই ভবিষ্যৎ মহাবনস্পতির সূচনা দেখা দিয়াছিল। ক্ষুদ্রের মধ্যে মহৎকে প্রত্যক্ষ করিতে পারা এবং ক্ষুদ্র বলিয়া কিছুকে অবজ্ঞা না করার মধ্যে যে একটি বিরাট মহত্ত্ব আছে তাহা সকলে ধরিতে পারেন না।

তাঁহার কবিতায়ও দেখি—

বীর্য দেহো, ক্ষুদ্র জনে/না করিতে হীনজ্ঞান

তাঁহার বীর্যবান চরিত্রের মধ্যে এই হীনতা কখনও দেখা যায় নাই। কবি তাঁহার জমিদারির তথাকথিত ছোটোলোক প্রজাদের এত স্নেহ করিতেন যে অনেকে তাহা মনে করিতেন তাহাদিগকে বৃথা প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র। প্রজারাও তাঁহাকে অসামান্য শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার প্রজারা তাঁহাকে জেলার সরকারী জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের অপেক্ষা মহত্তর মনে করিত। একবার মফস্বলে এক জমিদারি কাজে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে তাঁহাকে যাইতে হইবে। তাঁহার এক দুর্ধর্ষ প্রজা তাঁহার জন্য একখানা মাত্র পালকি জোগাড় করিল। ভাবখানা এই, ম্যাজিস্ট্রেট তো চাকরমাত্র, সে হাঁটিয়া যাউক না কেন? বাহিরে দুর্ধর্ষ হইলেও ইহারা অন্তরে ছিল শিশুর মতোই সরল, এবং কবির প্রতি তাহাদের অতুলনীয় ভালোবাসা।

আশ্রমে আসিয়া দেখি এখানকার চাকর অনেকেই তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতি। আশ্রমের দুই-চার জন ‘নিষ্ঠাবান’ লোক ছাড়া আর সবাই তাহাদের হাতে শুধু জল কেন, অন্নও খান।

---

* নির্দিষ্ট করে বলা হয়তো যায় না, তবে রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল পাঁচজন ছাত্র নিয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রম শুরু হয়েছিল, বিভিন্ন স্মৃতিকথার ভিত্তিতে এই রায় দিয়েছেন। দ্র. *রবিজীবনী* ৫ পৃষ্ঠা ৪৩

বলা বাহুল্য. এই ঘটনা অসহযোগ আন্দোলনের বহু পূর্বে এবং ইহার মূলে সেই সময়ে কোনো রাজনৈতিক হেতু থাকিবার কথা ছিল না। তাঁহার বলিষ্ঠ মানবপ্রেমের মধ্যে কোনোদিনই কাহারও প্রতি অকারণ ঘৃণার কোনো স্থান ছিল না।

ছোটো শিশুদের প্রতিও দেখিলাম তাঁহার শুধু স্নেহ নহে, তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা বিরাজিত। তাই তিনি শিশুদের সঙ্গে ব্যবহারে বা তাহাদের শিক্ষায়-দীক্ষায় কোথাও অনাদর সহিতে পারেন নাই। বাংলা ভাষায় শিশুপাঠ্য নামে পরিচিত জোলো সাহিত্য তাঁহার অসহ্য, কারণ তাহাতে শিশুজীবনের প্রতি দুঃসহ অপমান প্রকটিত। শিশুদের সঙ্গে কবির অপূর্ব সখ্য। শিশুদের পড়াইবার প্রণালীও তাঁহার চমৎকার। সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তখনই অনেকগুলি শিক্ষাগ্রন্থও রচিত হইয়াছে। শিশুদের লইয়া তিনি তখন পশুপাখি তরুলতা প্রভৃতির সেবা করেন। সন্ধ্যায় তাহাদের লইয়া কত আমোদ-প্রমোদের মজলিশ জমাইয়া তোলেন।

'মিটিং' জিনিসটা আমরা বিদেশ হইতে আমদানি করিয়াছি। সেটা এখনও আমাদের দেহ-মন-প্রাণের সঙ্গে ভালো করিয়া মিশ খায় নাই। কিন্তু 'মজলিশ' আমাদের পুরাতন। আমাদের দেশের আনন্দময় মজলিশগুলি সব গেল কোথায়? আমাদের দেশে আনন্দ-উৎসবের যে-সব ধারা অন্তর্হিত হইয়া আসিতেছে, দেখিলাম তাহার জন্য কবির চিত্তে খেদের অন্ত নাই। আনন্দ-উৎসবের জন্য তাঁহার অন্তরের ব্যাকুলতা পরবর্তী কালে তাঁহার Philosophy of Leisure নামক বিখ্যাত বক্তৃতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। কানাডাতে তিনি এই বক্তৃতাটি দেন। শুনিয়াছি, কলিকাতাতে তাঁহাদের একটি মজলিশ ছিল। গীতিরচয়িতা কবি অতুলপ্রসাদ সেন, নাটোরের মহারাজা প্রভৃতি তাহাতে যুক্ত ছিলেন। *চিরকুমার সভা গোড়ায় গলদ বৈকুণ্ঠের খাতা*, 'বিনি পয়সায় ভোজ' প্রভৃতি রচনা করিয়া কবি বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ আনন্দরসের জন্য একটি প্রশস্ত স্থান অধিকার করিয়াছেন। ঠাট্টা তামাশা তীব্র বিদ্রূপ satire প্রভৃতিতেও কবি অতুলনীয় শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

শান্তিনিকেতনে শিশুদের মজলিশ ছিল একটু ভিন্ন ধরনের। দিবসের কর্মের অবসানে সন্ধ্যাকালে শিশুদের লইয়া তিনি বসিতেন। তাহাদের জন্য চমৎকার সব গল্প রচনা করিয়া তিনি বলিতেন। এই উপলক্ষে অনেকগুলি হেঁয়ালি-নাট্যও রচিত হয়। এই হেঁয়ালি-নাট্য প্রথা বিদেশ হইতে আমদানি করা। তাহার নাম Charade। শিশুদের আনন্দ দিবার জন্য এই নির্দোষ আনন্দের আয়োজন তিনি বাংলাতে প্রবর্তিত করেন। শিশুরা এই সব নাট্য সুন্দর ভাবে অভিনয় করিত। তাহা ছাড়া তাহাদের আবৃত্তি, পাঠ, গান ও অভিনয়ের ব্যবস্থাও ছিল। তখনও তিনি নৃত্যশিক্ষায় হাত দেন নাই। ছেলেদের জন্য *মুকুট বাল্মীকিপ্রতিভা* মেয়েদের জন্য ***লক্ষ্মীর পরীক্ষা*** প্রভৃতি অভিনয়ে যে রসটি ফুটিয়া উঠিত তাহা অনবদ্য। সারাদিনব্যাপী কাজের মধ্যে শিশুরা এইসব আনন্দে ভরপুর সন্ধ্যার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। সঙ্গে সঙ্গে চলিত কবির গান রচনা ও শিশুদিগকে গান শেখানো। তাঁহার এই কাজে কবির প্রধান সহায় ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অজিতকুমার চক্রবর্তীও এইসব ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। আশ্রমের সন্ধ্যাগুলি গল্পে অভিনয়ে আবৃত্তিতে গানে ভরপুর হইয়া উঠিত।

এইসব উৎসবসভা বসিত কখনও বা ঘরে কখনও বা বাহিরে আশ্রমের শালবীথির তলে। কখনও দল বাঁধিয়া জ্যোৎস্নারাত্রে ছেলেরা আশ্রমসমীপে পারুলডাঙায় শালবনে বা খোয়াইর পাথুরিয়া ময়দানে গিয়া উৎসব জমাইত। তাহার মধ্যে যখন হঠাৎ কবি স্বয়ং গিয়া যোগ দিতেন তখন উৎসব আরও জমিয়া উঠিত। জ্যোৎস্নার আলোকে ছেলেরা ফিরিবার পথে কবির সঙ্গে হাঁটিবার পাল্লা দিত। প্রাণপণে দৌড়িয়াও ছেলেরা তাঁহাকে হারাইতে পারিত না। কবি তখন রীতিমতো হাঁটাচলা করিতেন। বোলপুর স্টেশন হইতে তখন আশ্রমে যাইবার একমাত্র উপায় ছিল গো-যান। দ্রব্যাদি গো-গাড়িতে রাখিয়া কবি স্টেশন হইতে দুই মাইল পথ হাঁটিয়াই আসিতেন, এক-এক সময় ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া এমন দ্রুত চলিয়া আসিতেন যে ছেলেদের হার মানিতে হইত। তবু তাহাদের আনন্দের অবধি ছিল না।

অজিতকুমার চক্রবর্তী ছিলেন সতীশচন্দ্র রায়ের বন্ধু। সতীশ রায় তখন পরলোকগত। তখনকার দিনে কবির খুব গভীর সাহিত্যালাপ চলিত অজিতকুমারের সঙ্গে। সকালে রাত্রিতে শীতকালের মধ্যাহ্নে শালবীথির পথে চলিতে চলিতে তাঁহাদের আলোচনা চলিতে থাকিত। এক-একদিন রাত্রি গভীর হইয়া গিয়াছে তবু আলোচনার বিশ্রাম নাই।

আমার পুরাতন বন্ধু বিধুশেখর শাস্ত্রীর কথা পূর্বেই বলিয়াছি, তাহা ছাড়া তখন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থলেখক বিখ্যাত জগদানন্দ রায় ও প্রসিদ্ধ শাব্দিক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যরসিক অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি অধ্যাপক আশ্রমকে অলংকৃত করিতেছিলেন। আমি আসিবার প্রায় এক বৎসর কাল পরে নেপালচন্দ্র রায় আসিয়া আশ্রমে যোগ দেন। অজিত চক্রবর্তী ছিলেন তাঁহার ছাত্র। ইংরেজি অধ্যাপকের কাজে প্রয়োজনবশত অল্পদিনের জন্য নেপালবাবুকে তাঁহার ছাত্র অজিতবাবুই ধরিয়া আনেন। রাজনৈতিক কারণে অধ্যাপনা ছাড়িয়া দিয়া নেপালবাবু যাইতেছিলেন ওকালতি ব্যবসায়ে যোগ দিতে। এইখানে আসিয়া তাঁহার ওকালতি গেল ভাসিয়া। তাঁহার বাকি কর্মময় জীবন তিনি আশ্রমেই কাটাইয়া দিলেন। তখন আশ্রমের পরিচয় দেশের সীমাতেই বদ্ধ। পিয়ার্সন এন্ড্রুজ প্রভৃতি বিদেশি সুহৃদ্‌গণ তখনও এখানে আসিয়া যোগ দেন নাই।

কবির গানের ভাণ্ডারী ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ। যেমন ছিল তাঁহার গাহিবার শক্তি তেমনি ছিল তাঁহার অপূর্ব সুর-ধারণার শক্তি। তাঁহাকে পাইয়া যেন কবির সুরের প্রবাহ মুক্ত ধারায় বহিয়া চলিয়াছিল। এমন সহৃদয় গীতময় মানুষ এই সংসারে বিরল। গাহিতে বলিলে তাঁহার আর আপত্তি ছিল না। যোগ্য অযোগ্য কাহাকেও তিনি উপেক্ষা করিতেন না। সুরের দানসত্র খুলিয়া দিয়া উৎসবের আনন্দে আশ্রমকে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছিলেন। কবির যখন নূতন নূতন গান ও সুরের তাগিদ আসিত তখন সময়ে অসময়ে ডাক পড়িত দিনেন্দ্রনাথের। এক-এক সময় দিনের মধ্যে ও রাত্রিতে সাত-আট বার নূতন সুরের জন্য ডাক আসিয়াছে; কিন্তু দিনুবাবুর বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই, সব সময়েই প্রসন্নমুখে তিনি উপস্থিত। কবির অফুরন্ত সুরগঙ্গাকে মহাদেবের মতো ধারণ করিতে পারেন এমন একমাত্র ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ।

আমি আশ্রমে আসিলাম বর্ষাকালে। কবির অন্তরের মধ্যে যে ঋতু-উৎসবের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাহা আমাদিগকে জানাইয়া কয়েক দিনের জন্য প্রয়োজনবশত তিনি বাহিরে গেলেন। কাজেই কি করিয়া বর্ষা-উৎসব করা যায় সেই সমস্যা সবার মনে উপস্থিত হইল। দিনুবাবু লইলেন বর্ষা-সংগীতের ভার, অজিতবাবু রবীন্দ্রকাব্য হইতে ভালো ভালো সব কবিতা আবৃত্তির জন্য [বাছিতে] লাগিয়া গেলেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও বেদ হইতে বর্ষার ভালো ভালো সূক্ত আমরা সংগ্রহ করিলাম। বর্ষাকালের উপযুক্ত করিয়া প্রাচীনকালের মতো উৎসব-বেদি সাজানো হইল। নীল বস্ত্রে প্রাচীনকালের মতো সহজ গম্ভীর-নেপথ্যে বর্ষার উৎসবটি সমাপ্ত হইল। গুরুদেব আসিয়া উৎসবের সাফল্যের কথা শুনিয়া খুব খুশি হইলেন।

১৯০৮, বর্ষা গেল। খুব ভালো করিয়া শারদ-উৎসব করিবার জন্য কবি উৎসুক হইলেন। আমাদিগকে বলিলেন বেদ হইতে ভালো শারদশোভার বর্ণনা খুঁজিয়া বাহির করিতে। সংস্কৃত সাহিত্যের নানা স্থানে খোঁজ চলিল। কবি লাগিয়া গেলেন শরৎকালের উপযুক্ত সব গান রচনা করিতে। একে একে অনেকগুলি গান রচিত হইল। ক্রমে তাঁহার মনে হইল গানগুলিকে একটা নাট্যসূত্রে বাঁধিতে পারিলে ভালো হয়। তাহার পর তৈরি হইয়া উঠিল *শারদোৎসব* নাটক। এই গানগুলির মধ্যে দুই-একটি পুরাতন গানও আছে। 'তুমি নবনবরূপে এস প্রাণে' গানটি ১৮৯৪ সালের পত্রে উল্লিখিত (*ছিন্নপত্র*, পৃঃ ২০১)।

আশ্রমেও আমার 'ঠাকুরদাদা' নামটি চলিত হইয়া পড়িয়াছিল। কবি মনে ভাবিয়াছিলেন আমি ভালো গাহিতে পারি। তাই *শারদোৎসবে* ঠাকুরদাদার ভূমিকাটি আমাকেই দেওয়া হইবে ঠিক করিয়া তাহাতে অনেকগুলি গান ভরিয়া দেওয়া হয়। যখন আমি বলিলাম গান আমার দ্বারা চলিবে না তখনও কবির সংশয় দূর হইল না। তিনি অগত্যা অজিতবাবুকে ঠাকুরদাদার ভূমিকা গ্রহণ করিতে বলিয়া আমার উপর সন্ন্যাসীর পার্ট করিবার আদেশ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও গান আছে, যদিও সংখ্যায় অল্প। তাহা লইয়া ভারি বিপদ বাধিল। অগত্যা ঠিক হইল সন্ন্যাসীর অভিনয় আমি করিব; তাহাতে গান থাকিলেও, গানের সংখ্যা অনেক কম। তাই কথা হইল গানের সময়ে বাহিরে আমার অভিনয় চলিলেও ভিতর হইতে কবিই গান করিবেন। *শারদোৎসব* নাটকটি দেখিয়া সকলেই প্রীত হইলেন। বাহিরের লোকেরা আমার গান শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। সকলেই বলিলেন, "এত দিনে এমন এক জন লোক দেখা গেল যিনি গানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে পারেন।" সহজে এই কৃতিত্ব লাভ করিয়া খুব খুশি হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু পরে এইজন্য আমাকে বহু দুঃখ সহিতে হইয়াছে। যেখানেই যাইতাম লোকে গানের জন্য করিতেন পীড়াপীড়ি। "পারি না" বলিলে কেহ বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহারা স্বকর্ণকে কেমন করিয়া অবিশ্বাস করিবেন। বহুদিন পর্যন্ত আমার দুর্গতির আর অন্ত ছিল না।

ইহার পর আশ্রমে নানা সময়ে *অচলায়তন ডাকঘর রাজা ফাল্গুনী প্রায়শ্চিত্ত* প্রভৃতি নাটক অভিনীত হইয়াছে। তাঁহার পূর্বেকার রচনা *বাল্মীকিপ্রতিভা মুকুট* প্রভৃতি নাটক ছেলেরা অভিনয় করিয়াছে, মেয়েরা *লক্ষ্মীর পরীক্ষা* করিয়াছে, *রাজা ও রাণী তপতী* প্রভৃতি অভিনীত হইয়াছে, সর্বত্রই নাট্যগুরু ছিলেন কবি স্বয়ং, অনেক সময়ে প্রধান অভিনেতাও তিনিই। অভিনয়